লালন সাঁইয়ের গান

শক্তিনাথ ঝা

ঢাকা : বাংলা মোটর | শাহবাগ | বাংলাবাজার
চট্টগ্রাম | রাজশাহী | সিলেট

বাংলাদেশ সংস্করণের ভূমিকা

লালন সাঁইয়ের গান প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার কবিতা পাক্ষিক থেকে। তারা বইটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশ করে। তারপর গ্রন্থটির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় তথাগত প্রকাশন থেকে।

লালনের গানের বহু সংকলন বাজারে পাওয়া যায়। বর্তমান সংকলনের গানগুলো ভোলাই শাহ ফকিরের খাতা থেকে, সাধক-গায়কদের রক্ষিত খাতা এবং কণ্ঠ থেকে, প্রামাণ্য মুদ্রণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তারপর সাধকদের দিয়ে এ সমস্ত গান যাচাই করে, পদাবলির পর্যায় এবং অর্থসংকেত দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে লালনের জাল গান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লালনের হিন্দি অনুবাদে রামেশ্বর মিশ্র এবং ইংরেজি অনুবাদে ক্যারল সলমন এ গ্রন্থের পদাবলিকে মান্যতা দিয়েছেন। সঠিক পাঠ নির্ণয়ে, গানের ব্যাখ্যায় এবং পাদটীকায় *লালন সাঁইয়ের গান* মহাকবি লালনের প্রামাণ্য গানের সংগ্রহ হিসেবে গৃহীত হলে বাধিত হব। বাংলাদেশে এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বাতিঘরকে ধন্যবাদ জানাই।

শক্তিনাথ ঝা
আগস্ট ২০২৩

সূচি

পদাবলির অক্ষরানুক্রমিক সূচি ১১–২৮

লালন সাঁইয়ের গান এবং জীবন ৩৩–৮৪

গান

প্রথম খণ্ড : ভোলাই শাহের খাতা থেকে ৮৫–২৩০

দ্বিতীয় খণ্ড : বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত ২৩১–৩০১

পরিশিষ্ট

গানের পর্যায় এবং অর্থসংকেত ৩০৩–৩৭৫

লালন সাঁইয়ের গান এবং জীবন

অদ্যাবধি কুড়িটির বেশি লালনগীতির সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দু-একটি বাদ দিলে এগুলি সম্পাদনা করেছেন শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা। লালনপন্থীদের অর্থ বা পাণ্ডুলিপি না থাকায়, তারা লালনের গান মুদ্রিত করতে পারেননি। ক্ষমতা না থাকায় গ্রন্থস্বত্বের অধিকারে তারা সংকলনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। *প্রবাসীতে* (১৩২২, কার্তিক) বাউলগানের পাঠান্তর আলোচনায় অবিনাশচন্দ্রের মন্তব্য ছিল, 'এইসব গ্রাম্যগান একরকম বেওয়ারিশি মাল। যে যেভাবে ইচ্ছা ইহাদের উপর নিজ নিজ কেরদানি জাহির করে। গানের পদ তো পরিবর্তন করেই, এমনকি রচয়িতার নামেরও গোলমাল করিয়া বসে এবং একগানের পদ আনিয়া অন্য গানের সহিত যোগ করিয়া দেয়।' লালনবৃত্তের আনোয়ার হোসেন এবং পদকর্তা পাঞ্জু শা-এর পুত্র রফিউদ্দিন মুদ্রিত লালনের গানের ভ্রান্তি এবং বিকৃতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ সমালোচনা ধ্বনিত হয়েছে লালনগীতির সংকলনগুলির ভূমিকায়, মননশীল সমালোচকদের লেখায়।

মীর মশাররফ হোসেন, দুর্গাদাস লাহিড়ি, অনাথকৃষ্ণ দেব, কুমুদনাথ মল্লিক এবং শরৎকুমার লাহিড়ি গুরুত্বসহকারে লালনের গান মুদ্রিত করেছিলেন তাঁদের গ্রন্থে। সম্ভবত হরিনাথ মজুমদার, *কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড বেদ* (১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, ১২৯২, পৃ. ২৫১) গ্রন্থে লালনের 'কে বোঝে সাঁইর লীলাখেলা' গানটিকে সর্বপ্রথমে মুদ্রিত করেছিলেন। *ভারতী* পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩০২) সরলা দেবী, লালনের ন'টি গান প্রকাশ করেন। এর সপ্তমসংখ্যক, 'সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'গানটিকে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তার লালনবিষয়ক নিবন্ধে ব্যবহার করেছেন।

প্রবাসী-এর হারামনি বিভাগে, ১৩২২, আষাঢ় সংখ্যায়, সতীশচন্দ্র দাস সংগৃহীত লালনগীতি (১) কথা কয় রে (২) পাখি কখন উড়ে যায় এবং ১৩২২, ভাদ্র সংখ্যায় করুণাময় গোস্বামী সংগৃহীত (১) দেখ না মন ঝকমারি (২) খুলবে কেন সে (৩) হায় চিরদিন পুষলাম, গানগুলি প্রকাশিত হয়। *প্রবাসী*-তে ১৩২২-এর আশ্বিনে ছ'টি; অগ্রহায়ণে তিনটি (একটি অসম্পূর্ণ), পৌষে পাঁচটি এবং মাঘে ছ'টিসর্বমোট কুড়িটি লালনের গান রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। *প্রবাসী*র ১৩২৩, শ্রাবণে

হরেন্দ্রনাথ মণ্ডল 'হুকার গান' এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৩৩১, চৈত্র) ছ'টি লালনের গান প্রকাশ করেছিলেন। ১৩৩২-এর *প্রবাসীতে*, বসন্তকুমার পাল, লালনের জীবনী আলোচনায় ১১টি গানের উল্লেখ করেছেন। বসন্তকুমার ছিলেন কুমারখালি, ধর্মপাড়ার বাসিন্দা। তিনি লালনের আত্মীয় এবং শিষ্যদের কাছ থেকে তথ্য ও গান সংগ্রহ করে *মহাত্মা লালন ফকির* (১৩৬২) রচনা করেন। এ গ্রন্থে লালনের পূর্ণ ও আংশিক বহুগানের উল্লেখ আছে।

বিভিন্ন সাধক গায়কের গানের খাতা এবং লালনগীতি সংকলনের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ এবং ব্যবহার আমরা করেছি।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, *হারামনি*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৩৭
হারামনি, ২য় খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২
ওই, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৪৮
ওই, ৫ম খণ্ড, বাংলা বিভাগ, ঢাকা, ১৩৬৮
ওই, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা, ১৩৭৪
ওই, ৭ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৭১
ওই, ৮ম খণ্ড, ওই, ওই, ১৩৮৩
মহম্মদ আবু তালিব, *লালনগীতিকা* (২য় খণ্ড), ১৯৬৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭৮ (প্র.স. ১৩৬৪)। (২১০টি লালনের গান)
মতিলাল দাশ। পীযূষকান্তি মহাপাত্র, *লালনগীতিকা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ (৪৬২টি লালনগীতি)
বসন্তকুমার পাল, *মহাত্মা লালন ফকির*, শান্তিপুর, ১৩৬২
খোন্দকার রফিউদ্দিন, ভাবসংগীত, ১৯৫৫। যশোহর, পূর্ব পাকিস্তান এখানে, ৫৩৪টি পদ লালনের।
অন্নদাশঙ্কর রায়, *লালন ও তাঁর গান*, শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৩৮৭ (২য় সংস্করণ) ৪০টি গান লালনের।
ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ), *লালন সংগীত* (১ম খণ্ড), ১৪০০, ছেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ (৩০০টি গান)।
ওয়াকিল আহমদ, *বাউল গান*, ২০০০, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ওয়াকিল আহমদ, *লালন গীতি সমগ্র* (৬৪০টি গান), বইপত্র, ঢাকা-১১০০, ২০০২।
সুকুমার সরকার, লালনের গান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা সমিতি, কদমখালি, নদিয়া, ২০০৩ (১০৩টি গান)।

সনৎকুমার মিত্র, *লালন ফকির কবি ও কাব্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৮৬।
শক্তিনাথ ঝা, *ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প*, সংবাদ প্রকাশক, ১৯৯৫, কলকাতা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদী আবেগে পৃথিবীর নানা স্থানে লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে, মুদ্রিত করার এক প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। R.M. Dorson-এর মতে এগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত এবং বিকৃত।[১] লালনের সাধনার জগতের সঙ্গে সম্যক পরিচিতির অভাবে, গায়ক এবং লিখিত খাতার প্রতি অবজ্ঞা এবং যথেষ্ট মনোযোগের অভাবে, নিজেদের বিজ্ঞতাকে আরোপের প্রবণতায় লালনের গানগুলি, 'তিন নকলে আসল খাস্তা হয়ে লোক কবিদের ভাবপূর্ণ গীতির অর্থবোধ হয় না।' মুদ্রিত গ্রন্থের গানগুলি ভুলভ্রান্তিতে পূর্ণ।[২]

ক্ষিতিমোহন সেনের *বাউল গান* সম্পর্কে গুরুতর সমালোচনা করেছেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং অনেকে। মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন ১৯৩০ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত *হারামনি*র বিভিন্ন খণ্ডে প্রায় ২২৫টি লালনের গান সংগ্রহ করে; ৫৬৩টি গানের এক সূচি প্রণয়ন করেছিলেন। লালনের আখড়ার খাতার কথা তিনি জানতেন। কিন্তু কোনো গানের পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি গান সংগ্রহ করেননি। যে গায়কদের কাছ থেকে তিনি গান সংগ্রহ করেছেন তাদের স্থান, কাল, পাত্র যথাযথভাবে উল্লিখিত নয়। অনেক সময় অন্যের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে তার গান। সেগুলি বিকৃত এবং ত্রুটিপূর্ণ। উপেন্দ্রনাথ উত্থাপিত এবং আবদুল হাই সমর্থিত, তার সংগ্রহের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে গায়কের মুখের গান সম্পাদনা না করেই তিনি হুবহু মুদ্রিত করেছেন। কিন্তু *হারামনি*র সংগ্রহে কথ্যভাষা, কলি বিভাগ, আঞ্চলিক উচ্চারণের বানান নেই। যাদের কাছ থেকে গান সংগ্রহ করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে লালনের পরস্পর সম্পর্ক অনির্দিষ্ট। ১৩৬৮ থেকে ১৩৮৩ পর্যন্ত চার খণ্ডের বিরুদ্ধে, ওয়াকিল আহমেদের অভিযোগ, কোনো কোনো গানে শব্দ পাল্টিয়ে ইসলামের লেবাস দেওয়ার চেষ্টাও লক্ষ করা যায়।'[৩] তাঁর ৫ম খণ্ড, সম্পাদনা করেছেন আবদুল হাই। কিন্তু সংগৃহীত গানকে বর্জন তো সম্পাদক করতে পারেন না। মনসুরউদ্দিনের তথ্যসূত্রহীন, সন্দেহযোগ্য গানকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি।

বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে আবু তালিবের সম্পাদনায়, ২ খণ্ডে *লালন শাহ* ও *লালনগীতিকা*-এ মোট ৬২৬টি গান সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু পদ লালনের নয় বলে তালিবের ধারণা। কিন্তু সেগুলি চিহ্নিত বা বর্জিত হয়নি। একটি আদর্শ খাতার উল্লেখ করেছেন তিনি বহুবার; কিন্তু এটির মালিক বা তারিখের প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছেন। খাতা, গায়ক, মুদ্রিত গ্রন্থ ভাবসংগীত, বাংলার বাউল বা বাউল গান, লালন গীতিকা তিনি ব্যবহার করেছেন। ভাবসংগীতের পাঠকে, তুলনায়

শুদ্ধতর তিনি বিবেচনা করেছেন। *লালনগীতিকার* সম্পাদক 'শব্দগুলির উদ্দিষ্ট অর্থ ধরিতে না পারায়' ভ্রান্তি ঘটেছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।[৪] ইসলামি ঐতিহ্যের বিষয়ে এ ভ্রান্তি ঘটেছে *লালনগীতিকায়*। কিন্তু ভাবসংগীতের বৈষ্ণব পরিভাষার ভ্রান্তি বিষয়ে তিনি নীরব। তালিবের গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের কথ্য এবং আরবি-ফারসি শব্দাদির ব্যবহার যথাযথ। কিন্তু ভাষায়, স্তবক গঠনে, পঙ্‌ক্তি সজ্জায় লৌকিক নয় শিষ্ট-ঐতিহ্য অনুসৃত হয়েছে। গানের সাধন-সংক্রান্ত শব্দার্থ বোঝার ভ্রান্তি তালিবের গ্রন্থে প্রচুর। নিজেদের পাণ্ডিত্য এবং বিজ্ঞতাকে, লালনের জগৎকে না জেনেই, লালনের গানে আরোপ করে সংস্কৃত করার ফলে বহু গান ক্ষেত্রবিশেষে অস্পষ্ট, অর্থহীন এবং অর্থান্তরিত হয়ে গেছে।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গান সংগ্রহ করেছেন (১) রবীন্দ্র-ভবনের এবং তার উৎস লালনের আশ্রমে রক্ষিত খাত থেকে, (২) গায়কদের খাতা থেকে, (৩) প্রামাণ্য গায়কদের মুখ থেকে। অবশেষে লালনপন্থী গায়ক হীরু শাহ্, খোদাবক্স শাহ এগুলি সংশোধনে সাহায্য করেছেন। উপেন্দ্রনাথের ক্ষেত্র সংগ্রহ এবং পরিশ্রম অনন্য। তিনি লিখেছেন, 'অশিক্ষিত গায়ক না বুঝে সাধনা বা ভাব শব্দ বিশেষ পরিবর্তন করার ফলে পদ অর্থহীন হয়ে গেছে। খাতা লেখকদের অজ্ঞতার জন্য বানান ও শব্দ বিকৃত হয়েছে।' যেকোনো গায়কের, যেকোনো খাতা সম্পর্কে এ কথা সঙ্গত নয়। সম্পাদনার রীতি ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন, 'গানের ভুল সংশোধন করে, বিচার বিবেচনার দ্বারা প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা হয়েছে। অর্থহীন শব্দ স্পষ্টত নিতান্ত অশুদ্ধ ও বিকৃত ভাষা সংশোধন ছাড়া, ভাষা বা ছন্দে বিন্দুমাত্র হাত দেওয়া হয় নাই।'[৫] এ দায়িত্ব একক ব্যক্তি পালন করতে গিয়ে সমস্যা হয়েছে। গবেষকরা এবং সর্বজনস্বীকৃত লালনপন্থীরা মিলেমিশে এ কাজ করাই ছিল সঙ্গত। উপেন্দ্রনাথের সংগ্রহে অলালনীয় বা জাল গান নেই। কিন্তু স্বরলিপিতে কলি শব্দ (পৃ. ১১৪৯) ব্যবহার করলেও কলি বিভাগ নেই এ সব গানে। কমা, সেমিকোলনের ব্যবহার, শিষ্ট কবিতার পঙ্‌ক্তি বিন্যাস এবং স্তবক বন্ধন অনুসরণ করে, আঞ্চলিক উচ্চারণ ও ভাষা আংশিক রেখে, আংশিক শুদ্ধ করে তিনি সর্বত্র গানের আদিরূপকে বজায় রাখতে পারেননি। শিষ্টজনের উপযোগী করে গানগুলিকে পরিবেশন করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। গায়ক এবং খাতার অশুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞায় তিনি বহুক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

পাঞ্জু শাহের সন্তান, খোন্দকার রফিউদ্দিন, *ভাবসংগীতে* (১৯৫৫) পাঞ্জুর গানের উৎসসূত্রের নির্দেশ করলেও, লালনের গানের কোনো প্রামাণ্য উৎসের উল্লেখ করেননি। পত্র-পত্রিকায় তিন নকলে আসল খাস্তা হয়ে লালনাদির বাউলগানের বিকৃত প্রকাশের বিরুদ্ধেই তার গ্রন্থ প্রকাশ। তিনি গানগুলি 'সংশোধিত' করেছেন; কিন্তু সংশোধনের ক্ষেত্র বা প্রকৃতি আলোচিত হয়নি। এগুলিতে ধর্মবিশ্বাসের গোঁড়ামি আরোপ করা হয়নি'এ মন্তব্য সত্ত্বেও, পাকিস্তানপর্বের। সাম্প্রদায়িকতা,

ভাবসংগীতেও দৃষ্ট হয়। তালিব, এ গ্রন্থকে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্যের মর্যাদা দিয়েছেন। লালন পরম্পরার বাহ্যরূপ-রীতির, পদবিন্যাসের প্রামাণ্যগ্রন্থ ভাবসংগীত। বৈষ্ণব শব্দ, পরিভাষা ব্যবহারে রফিউদ্দিন সর্বদা সঠিক নন।

ভোলাই শাহের প্রশিষ্য এবং লালনের আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ) *লালনসংগীতে* তিনশত গান প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের ভ্রান্তিপূর্ণ গানের বিরুদ্ধে তার গ্রন্থপ্রকাশ। প্রবীণ গায়ক এবং তাদের খাতা এ সংকলনে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অঙ্গসজ্জায় এবং লালনের বিতর্কিত গানের অন্তর্ভুক্তির কারণে এ গ্রন্থ প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা পায়নি। ভূমিকায় যে জাল, নকল, বিকৃত পদকে আবুল আহসান চৌধুরী নিন্দা করেছেন, তারই একটিকে মন্টু শাহ লালনের জীবনে যুক্ত করেছেন (পৃ. ৩১)।

শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভূমিকায় এবং পীযূষকান্তি মহাপাত্র ও মতিলাল দাশের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত *লালনগীতিকা* এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খাতা, লালনের আখড়া থেকে সংগৃহীত মতিলাল দাশের খাতা, উপেন্দ্রনাথের সংগ্রহ শুদ্ধ করে, বিকৃত ভাষা এবং অর্থহীন শব্দ সংশোধন ছাড়া 'ভাষা ও ছন্দে বিন্দুমাত্র হাত দেওয়া হয়নি' ভূমিকার এ দাবি যথার্থ নয়। পীযূষবাবু, রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত যে গানের খাতায় উর্দুর মতো 'ডান থেকে বামে' লেখা দেখেছেনসনৎ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত গানে তার চিহ্নমাত্র নেই। এ সংকলনের জাল বা ভেজাল গান নেই। গানের পঙ্‌ক্তি, শব্দে, স্তবকের নির্মাণে দ্বিমত আছে। এখানে লৌকিক ভাষা এবং রীতিকে শিষ্ট রূপ দেওয়া হয়েছে।

ওয়াকিল আহমেদ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ একজন গবেষক। তিনি *বাউল গান* এবং *লালন গীত সমগ্রে* মোট ৬৪০টি পদকে স্থান দিয়ে এর মধ্যেই লালনের সমস্ত পদ আছে জানিয়েছেন। বিভিন্ন সূত্রের মুদ্রিত গানকে (১৯৪৭-এর আগেকার) এবং মনসুরউদ্দিনের মুদ্রিত সংগ্রহের গান পাঠান্তরসহ তিনি গ্রহণ ও আলোচনা করেছেন। মুদ্রিত গানগুলিকে ধুয়া, অন্তরা, সঞ্চারী আভোগের ব্যতিক্রমহীন ছকে বিচার করেছেন আহমেদ। শিষ্ট কবিতার চরণে তিনি বিচার করেছেন অন্তমিল বা স্তবক রচনা। কলি বিভাগ এবং কলির অন্তর্পার্বিক মিল বা অমিলকে তিনি গুরুত্ব দেননি। তার গানের সম্পাদন এবং শব্দ নির্বাচন, বহুক্ষেত্রে প্রশ্নযোগ্য। যেমন ২৬২ নং পদটিতে (আমাদের ২১২), লালন ফকির কবি ও কাব্যের, পাঠকে তিনি শুদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'একবার চাঁদবদনে বল রে ভাই'—কী বলতে বলা হচ্ছে। পরে কোথাও এর উত্তর নেই। ভোলাইয়ের খাতায় 'সাঁই' শব্দটি পাওয়া যায়। সাঁইয়ের নাম করতে বলা হচ্ছে-এটিই প্রামাণ্য। পূর্ববর্তী পদেও সাঁইকে ভাই করা হয়েছে। লালনের কলিগুলি সর্বত্র মিত্রাক্ষর দিয়ে আবদ্ধ থাকে। এখানে ৫টি অন্তমিল সাঁই, নাই, ভাই, তাই, জাই (যাই)।

আহমদ শেষ কলির মিত্রাক্ষরে লিখেছেন 'যায়'। ভোলাই-এ 'আই'। লালন অক্ষমতার দায় অন্যকে না দিয়ে ভণিতায় নিজে বহন করেন। 'আখেরে খালি হাতে সবাই যাই' অর্থ তাৎপর্য এবং ছন্দের প্রয়োজনে 'যাই' শব্দটি এখানে অনিবার্য। এটি আত্মতত্ত্ব বা মনঃশিক্ষার পদ। শিক্ষা দিচ্ছেন লালন নিজের মনকে। এখানে শেষ পঙ্‌ক্তির 'সে ধন' শব্দটি ভ্রমাত্মক। বিষয়, বাড়িঘর ইত্যাদি সর্বজন পরিচিত 'এ ধন' কারো সঙ্গে যায় না। ১৩ নং পঙ্‌ক্তিতে 'সে ধন' নিকটে থাকে, মানুষ তাকে জানে না। শব্দের অপব্যবহার ঘটেছে ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে 'পথের পতিত চিনে ধর'-এর অর্থ কী? *লালনগীতিকায়* 'পথের পণ্ডিত' শব্দের অর্থ হতে পারে। ভোলাইয়ের 'পথিক' শব্দটি এখানে যথার্থ বলে আমরা মনে করছি। লালনের শিষ্য বলে কথিত কিনুর একটি পদ (২৫৩) লালনের বলে চিহ্নিত হয়েছে আহমদের গ্রন্থে।

হারামনির, মনসুরউদ্দিনের অনেক গান বিরূপ মন্তব্য করেও আহমদ গ্রহণ করেছেন; আমরা সেগুলি গ্রহণ করিনি। যেমন :

১. অকুল পাড় দেখে মোদের লাগল রে ভয় (৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৭-৪৮) গানটি অসম্পূর্ণ; ভাষাভঙ্গি অর্বাচীন।

২. আপনাকে আপনে যে জন জানে (২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮)। ভণিতাহীন গান।

৩. মানবদেহের ভাব জেনে কর সাধনা (৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৩)। আরবি অক্ষরের মানবদেহে নির্ণয় এর বিষয়বস্তু। ন-কলির দীর্ঘ এ পদটি, দরবেশ লালনের নামে, অন্য কারো রচনা বলেই মনে হয়।

৪. 'উবুদ করা নদী' (৬১৮) অর্থহীন পদ; পশুবধের তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা (৬২৩) অলালনীয়। 'যে রূপে সাঁই আছে মানুষে' অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত পাঠ গ্রহণযোগ্য নয় (আহমদ, লা. গী. সমগ্র, পৃ. ৩৪২)। অন্য বহু গান সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন ড. আহমদ নিজেই (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১, ৩৬১)। অন্য সূত্রে মুদ্রিত কিছু গানকে আহমদ গ্রহণ করেছেন।

৫. চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে ১৯৩৭-এ প্রকাশিত সরোজকুমার রায়চৌধুরীর *গৃহকপোতী* উপন্যাসে এটি মদন শা ফকিরের পদ হিসাবে সংকলিত হয়েছিল। ১৯৪৭-এর আগে এটি লালনের নামে উল্লিখিত হয়নি।

৬. তৃপ্তি ব্রহ্ম সংকলিত আরবি ভাষায় বলে আল্লা (৬১৫), এমন সমাজ কবে গো (৬২১), বারতাল উদয় (৬৩৪)—বিষয় ও ভাষাগত বিচারে, তথ্যসূত্রহীন এ সমস্ত পদকে আমরা লালনের বলে গ্রহণ করিনি। 'এমন সমাজ কবে গো' গানটিকে আবুল আহসান চৌধুরীও প্রত্যাখ্যান করেছে। 'আবার কেউ তাঁকে সমাজবিপ্লবী ও সাম্যতন্ত্রের ঘোষক হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন' (ভূমিকা, *লালনসংগীত*, পৃ. ১২)।

মধ্যযুগে ইসলামি সমাজে কোরানের এবং সুফি সমাজে নানাবিধ গ্রন্থ ও পদাবলী সংগ্রহের হস্তলিখিত পুঁথির প্রচলন ছিল। চৈতন্যবাদের দক্ষিণ ভারত থেকে একাধিক পুঁথির অনুলিপি করেছিলেন নিজস্ব লেখনীয়াকে দিয়ে। বৈষ্ণব-বাউল সমাজে পদাবলী, কড়চা, ভাগবতাদি, চৈতন্যজীবনী গ্রন্থাদির হস্তলিখিত অনুলিপি; 'কলমী পুঁথির' প্রচলন ছিল। লেখার রীতিপদ্ধতির নানা ভিন্নতা ছিল। লালনের সমকালে মুদ্রাযন্ত্র চালু হয়েছিল। কুমারখালিতে হরিনাথ মজুমদার পত্রিকা মুদ্রণ করতেন। লালনের মতো গায়কেরা, যারা গানের 'বাহাস' করতেন, তাদের নিজস্ব গানের খাতা ছিল এবং শিক্ষিত কেউ সে খাতা থেকে গান ধরিয়ে নিতেন। লালনোত্তর কালে প্রশ্নোত্তরী গানের খাতা গায়কদের নিত্যসঙ্গী ছিল। *হারামনি*র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাউল গান শোনার সঙ্গে, 'তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি' বলে মন্তব্য করেছেন। লালন লিখতে জানতেন কি না জানি না। কিন্তু তার আখড়াবাসী এবং বাইরের শিষ্যদের অনেকেই শিক্ষিত ছিলেন। তারা লিখে রাখতেন লালনের মুখরচিত পদাবলী। লালনের গানের মৌখিক রূপের সমান্তরালে ছিল তার গানের একটি লেখ্যরূপ। বিভিন্ন গবেষক লালনের গানের খাতা দেখেছেন এবং গানের খাতা নিয়ে লালনের আখড়ার পরিজনদের বহু অভিযোগ তুলে ধরেছেন। লালনের আখড়ায় এবং পরিজনদের কাছে লালনগীতির কোনো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ছিল না। ১৩১৬ সনে লালনের আখড়ার এক হস্তলিখিত পুরোনো খাতা থেকে গান সংগ্রহ করে (৫টি) সুবোধচন্দ্র মজুমদার, বঙ্গদর্শনে (৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) 'গ্রাম্য সাহিত্য' নিবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন। খাতা নিয়ে লালনপন্থীদের কোনো অভিযোগ তিনি শোনেননি। পরবর্তীকালে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে ছেউরিয়া আশ্রমের পরিচালক ভোলাই শাহ, লালনের গানের খাতা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে চলে গেছেন বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। লালনের আখড়ায় গান সংগ্রহ করতে গিয়ে একই অভিযোগ শুনেছিলেন মুন্সেফ মতিলাল দাশ। উপেন্দ্রনাথের কাছে ভোলাই এবং অন্য লালনপন্থীরা মতিলাল দাসের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ জানায়। জেলাশাসক অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে, হরিনাথ মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্র ভোলানাথ মজুমদার, লালনের আখড়ার শিষ্যবর্গসহ লালনের গানের প্রামাণ্য খাতা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বারংবার প্রার্থনা সত্ত্বেও ফেরত না পেয়ে, অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ছেউড়িয়া আশ্রমে লালনের গানের প্রামাণ্য কোনো খাতা না থাকায়, উত্তরকালে লালনের গান যথাযথভাবে মুদ্রিত হতে পারেনি।

*লালনগীতিকা*র ভূমিকায় মতিলাল দাশের, লালনের আখড়ার খাতা থেকে সংগৃহীত গানের উল্লেখ আছে (৩৭১টি)। এ গানগুলির আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পাণ্ডুলিপি পাইনি। কিন্তু আঞ্চলিক উচ্চারণভিত্তিক বানান, গদ্যের মতো পঙ্‌ক্তি বিন্যাস থেকে অনুমান করতে পারি যে রবীন্দ্রভবনের রক্ষিত

খাতাটির মতোই আদিতে কোনো অনুলিপি অথবা কোনো লালনপন্থীর ব্যবহৃত খাতা থেকে এগুলি সংগৃহীত হয়েছিল এবং *লালনগীতিকায়* সেগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৩২২, বৈশাখ, সংখ্যা থেকে *প্রবাসী* পত্রিকায় গ্রাম্য কবিতা সংগ্রহ *হারামনি* শুরু হয়। সূচনা সংখ্যায় ছিল রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত 'কোথায় পাবো তারে' গান ও স্বরলিপি এবং গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবি। বিশ বছর আগে ১৩০২-এ, *ভারতী* (ভাদ্র) সংখ্যায় এ গানটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ গানটির স্তবক উল্টোপাল্টা, ভাষা আধুনিক, অংশবিশেষ লুপ্ত; ভণিতায় নেই পদকর্তার নাম। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *প্রবাসী*তে, গানটি শুদ্ধ পাঠে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আর এ পাঠ ছিল *ভারতী*র অনুরূপ। উত্তরকালে, লালনের পদ প্রকাশের সূত্রে, প্রামাণ্য পাঠ ছিল অতীব জরুরি। লোকগান সংগ্রহের সূত্রেও লালনের গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল। ১৯৪৭ সালে, রবীন্দ্র-পরিবারের পক্ষ থেকে লালনের গানের দুটি খাতা (১৩৮(এ)১; ১৩৮(এ) ২) জমা দেওয়া হয় রবীন্দ্র-ভবনের গ্রন্থাগারে। এখানে সর্বমোট ২৯৮টি গান আছে। এ খাতা দেখেছেন উপেন্দ্রনাথ; ব্যবহৃত হয়েছে *লালনগীতিকায়*। ড. সনৎ মিত্র এটি আদ্যন্ত মুদ্রিত করেছেন, লালন ফকির কবি ও কাব্য, গ্রন্থে। আঞ্চলিক উচ্চারণ এবং বানানে গানগুলি লেখা। উপেন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকের মতে এটি জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যের অনুলিপি। সনৎ মিত্রের মতে, এ খাতা বামাচরণের লেখা নয়। লালনপন্থীদের এটিই মূল খাতা বিবেচনা করে, মিত্র, এর বাইরে লালনের সমস্ত গানকে ভেজাল বিবেচনা করেছেন। অদ্যাপি, এ পাণ্ডুলিপির তারিখ, লেখক, মালিক নির্ণয় হয়নি। রবীন্দ্রকৃত প্রবাসীতে প্রকাশিত *লালনগীতিকা*র ২০টির মধ্যে মাত্র ৯টি গান এ খাতায় আছে। এ ন'টির সব ক্রম ও পাঠও প্রকাশিত গানের সঙ্গে মেলে না। 'চাঁদে আছে চাঁদে ঘেরা' এ অপূর্ণ পদটি নেই এখানে। এ গানগুলির প্রামাণিকতায় তুষ্ট না হয়ে রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের অধিকতর প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। সে সূত্রেই ছেউড়িয়া আখড়ার লালনোত্তর অধিকারী, লালনের দত্তক পুত্র এবং পালিতা কন্যার স্বামী, ভোলাই শাহের লালনের গানের খাতা শান্তিনিকেতনে নীত হয় এবং আখড়ায় ফিরে যায় না। ভোলাইসহ লালন পরিজনেরা এ খাতার জন্য অভিযোগ এবং আবেদন-নিবেদন করেই চলেন। লালনের গানের খাতা রবীন্দ্রনাথের কাছেই ছিল। সনৎ মিত্রের মুদ্রিত খাতা ১৯৪৭-এ রবীন্দ্রভবনে জমা পড়ে। কিন্তু ভোলাই শাহের খাতাটি রবীন্দ্র পরিবারের কৃষ্ণ কৃপালনীর কাছে ছিল। সম্ভবত MS of Baul Songs (Collected by Tagore?) rare. মন্তব্যটি ইংরেজিতে তারই লেখা। তিনি সুধীর খাস্তগীরের কন্যা, শ্যামলী তান খাস্তগীরকে এটি দেখার জন্য দেন। শ্যামলীর সূত্রে এ খাতার গানগুলি দিয়ে আমার গবেষণা গ্রন্থ, *ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প* (১৯৯৫) প্রকাশিত হয়। খাতাটি আমরা রবীন্দ্রভবনে জমা দিয়ে দিই। সেখানে,